Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-I, October 2020, Page No.52-61
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিগত দুই দশকে বাংলাভাষায় রবীন্দ্রচর্চার গতিপ্রকৃতি (১৯৯১ – ২০১০)

শ্যামল কুমার মণ্ডল
গবেষক, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract :

Whenever we utter the name Rabindranath, an image of a sage like bright, noble personality appears in the eyes of our mind, who is much speculated both in our own country and the aboard. Many a scholars and critics have discussed much about him. Almost all Bengali speaking people living all over like the world got a close connection with Rabindranath. Rabindra literature and philosophy pervade a special place in the memories, culture and minds of Bengalee. This is a very small attempt on the part of this scholarly discussion about how the mode of Rabindra - discussion has covered the sky at our inner self in the previous two decades, it means from 1991 to 2010. Though this present scholarly discussion is a very small endeavour in comparison to the whole wide area of Rabindra - discussion and its field. Yet there is no bound of our learning about Rabindranath and his life. He is a unique precedent of Bengali language and culture. Only he can provide us the means of life even in such a difficult time. This scholarly discussion has given importance on some specific areas keeping in mind the specific much discussed topics about Rabindranath found in last 2 decades. Not only the literature, aesthetic and beauty of Rabindra writings but also the thoughts and ideas like – Rabindranath as a human being, rabindranath as an other personality, Rabindranath as a worker, Rabindranath as a protester - are given more importance in last 2 decades of Rabindra-discussion. How much these topics are relevant in the field of literary criticism and in our day to day queries is also shown in this discussion.

It is also shown in this discussion how much Rabindra-discussion influenced the minds of Bengalee people regarding the various discussions about Rabindranath Tagore published in several Bengali language journals and books in the last decade of 20th and first decade of 21 century. Besides this, in newspaper journals, institutes, art and culture, how much Rabindranath is relevant in our life till now is also highlighted in this present discussion. Getting involved in Rabindra-study, modern readers are searching many unknown or hidden sides or informations about him. The taste of modernity, profound knowledge and new insights which are found in Rabindra-writings utterly spell bound the the generous readers. In this way the exuberance to know about Rabindranath Tagore is gradually developing. Doing this, people living in our own country and all over the world are worshiping Rabindranath Tagore and his valuable works.

Keywords: Rabindra-literature, Rabindra-discussion, endeavor, aesthetic and beauty, Culture, journals, modernity, Tagore Research institute.

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি-হৃদয়ের অক্ষয় সম্পদ। দেশে দেশে কালে কালে এই মানুষটিকে নিয়ে আলোচনা এবং সমালোচনা কম হয়নি। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সেই ধারা আজও বহমান। কোথাও যেন এই মানুষটিকে আমরা চাই বা না চাই, ঠিক আমাদের মনে ঠাঁই করে নেয়। দুঃখে-সুখে, মান-অভিমানে, প্রেম-বিরহে, মানবতায় রবীন্দ্রনাথ যেন আমাদের আশ্রয় হয়ে ওঠে আর এই আশ্রয়কে প্রশ্রয় দেবার আনন্দে পাঠক যেন নব আনন্দে আপ্লুত হয়ে কলম ধরার প্রয়াস পায়। রবীন্দ্র আলোচনা ও সমালোচনার সরণিতে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার অবদান অবিস্মরণীয়। নতুন নতুন চিন্তা ও চেতনাকে তুলে ধরা, নানা দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে ভাবতে ও ভাবাতে শিখিয়েছে বাংলাভাষায় মুদ্রিত অনেক সমৃদ্ধ পত্রপত্রিকা। অবাক বিস্ময়ে আমরা ভেবেছি এভাবেও ভাবা যায়?। এই জিজ্ঞাসার নিরসন হতে না হতেই আরও বহু জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছে এবং রবীন্দ্রচর্চার পিপাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। আর বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক; কেননা মানুষটি যে রবীন্দ্রনাথ - যাঁর অনুভূতির তল খুঁজে পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। বলা যায় এই কঠিন কাজকে সহজ করে দিয়েছে এই পত্রিকাগুলি, যেখানে বিভিন্ন পণ্ডিত ও বিদগ্ধ মানুষদের কলমে নানা রবীন্দ্রনাথকে অনুভব করা যায়। এ প্রসঙ্গে *দেশ* পত্রিকাটি অগ্রগণ্য। বহু বছর থেকেই রবীন্দ্রচর্চাকে নতুন মাত্রা দিয়ে আসছে এই বিখ্যাত পত্রিকাটি। গুণমান ও গ্রহণযোগ্যতার বিচারে এই পত্রিকাটি কালোত্তীর্ণ হয়েছে নিঃসন্দেহে। রবীন্দ্রচর্চার সেতু বলা যায় এই পত্রিকাটিকে। ১৯৩৩ থেকে আজ পর্যন্ত *দেশ* পত্রিকা বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সেবা করে আসছে। রবীন্দ্র অনুশীলন ও চর্চার ক্ষেত্রে এই পত্রিকা যে ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করেছে তা অতুলনীয়। রবীন্দ্রচর্চার ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির নিরিখে এই পত্রিকা বিশিষ্ট ও অপরিহার্য। শুধুমাত্র *দেশ* পত্রিকাই নয় আরও অনেক পত্রপত্রিকা যেমন *পশ্চিমবঙ্গ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী, আকাদেমি* প্রভৃতি রবীন্দ্রচর্চার সাধনায় নিরন্তর ব্যাপৃত থেকেছে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনার হয়েছে প্রতিটি দশকে। আমাদের উদ্দেশ্য কেমন করে রবীন্দ্রনাথকেন্দ্রিক ভাবনাচিন্তা এবং ধ্যানধারণায় পরিবর্তনকে একালের পাঠকের মনচিত্রে প্রতিবিম্বিত করে তোলা।

বিশ শতকের নব্বই –এর দশকের প্রথমার্ধ থেকে একবিংশ শতকে পদার্পণ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৯১ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত *দেশ* পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চার এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। আমরা জানি, ১৯৯১ - এ রবীন্দ্র-তিরোধানের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়। বিশ্বভারতীর কপিরাইটের মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল এই ১৯৯১ সালেই। পরে সরকারি হস্তক্ষেপে এই মেয়াদ আরও দশ বছর বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত মেয়াদ সম্পূর্ণ হবার পর বিশুদ্ধ রবীন্দ্ররচনা পাওয়া যাবে কিনা, অগ্রন্থিত বহু রবীন্দ্ররচনা সন্ধান ও সংকলনের দায় ও দায়িত্ব কে নেবে, এইসব বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন উঠেছে গবেষক মহলে। এর উত্তর খুঁজেছেন চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভবতোষ দত্ত। এছাড়া বিশ্বভারতী নিয়ে স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি রয়েছে নিমাইসাধন বসুর 'ভগ্ননীড় বিশ্বভারতী'- নামক লেখায় যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এই পত্রিকায়। এ লেখার প্রতিবাদে ১৯ টি চিঠিপত্র ছাপা হয় পত্রিকায়। এ নিয়ে অম্লান দত্ত, অশীন দাশগুপ্ত, অশোক রুদ্রের মতো বিদগ্ধ মনীষী তাঁদের প্রবন্ধ লেখেন- বিশ্বভারতীর এখনও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রয়েছে। এর পুনর্গঠনের পরিকল্পনার খসড়াও তাঁরা রচনা করেন। এই একই বর্ষে বিখ্যাত রবীন্দ্র-সমালোচক অনাথনাথ দাস লেখেন বিখ্যাত প্রবন্ধ 'অপ্রকট রবীন্দ্রনাথ'। 'অপ্রকটচন্দ্র ভাস্কর' এই ছদ্মনামে বেশ কয়েকটি রচনা প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ। এইরকম দু'টি রচনা *সমালোচনী* মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শৈলেশচন্দ্র মজুমদার। অনাথনাথ দাস মহাশয় এই মাসিক পত্রের প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ সেগুলিকে প্রকাশ করেন। প্রথম রচনাটির নাম – 'রণরঙ্গিণী/আদর্শ উপসংহার'।

সমালোচনী পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয় ১৩০৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি হল - 'অনুস্বর বিসর্গ'। এটি প্রকাশিত হয় ১৩০৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়। রবীন্দ্রচর্চার বহমান স্রোতকে আশ্চর্যভাবে কলমের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছেন অনাথনাথ দাস এই প্রবন্ধে। আশামুকুল দাস রচিত 'ডাকঘরের কথা' লেখাটিও সুখপাঠ্য। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের অনেকটাই তৃষ্ণা নিবারিত হতে পারে এই রচনাটি পাঠ করে। ১৯৯২ সালে প্রকাশিত *দেশ* পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চার যে দিকটি সবচেয়ে বেশি আলোকিত সেটি হল পত্রাবলি সম্পর্কিত লেখালেখি। নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৯২ টি পত্র[১] মুদ্রিত। এই পত্রগুলির সংকলক পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুভূতির কথা যত না কাব্য-কবিতায় উদ্ভাসিত তার চেয়ে অধিক বেশি প্রকটিত তাঁর লেখা পত্রগুলি। বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে লেখা পত্রগুলি রবীন্দ্রমানসিকতাকে খাঁটিভাবে তুলে ধরে। একটি 'অপ্রকাশিত চিঠি'[২] শিরোনামে কল্যাণ কুণ্ডু আর একটি অজানা দিক নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। এখানে আর্নেস্ট রীজকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ১ টি চিঠি মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের ২৭ টি পত্র সংকলিত[৩] হয়েছে পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কালীমোহন ঘোষকে লেখা রবীন্দ্রনাথের ৪২ টি পত্র মুদ্রিত হয়েছে *দেশ* পত্রিকায়। এবং এটিরও সম্পাদনা করেছেন পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং। রবীন্দ্রচর্চায় *দেশ* পত্রিকা একাই অনেক অধ্যায় দখল করে নেয়। কেননা পত্রিকাটির ব্যাপকতা ও বিস্তার এতটাই যে কোনো মাপকাঠিতে একে মাপা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিভিন্ন নিবন্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিশ শতকের শেষ দশকে বহু খ্যাতনামা মানুষ প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন যা রবীন্দ্রচর্চায় অমূল্য সংযোজন। যেমন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও রবীন্দ্রনুরাগী অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন 'পূর্ব পশ্চিমের মাঝখানে' প্রবন্ধটি। তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র কবিরূপে বা বিশ্বসংস্কৃতির আদর্শ সমন্বয়ের প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত হননি। আজকের যে বিশ্বভারতী সেখানে তিনি সংস্কৃতির লিগ অব নেশনস এর পরিকল্পনা করেছিলেন। উগ্র জাতীয়তাবাদ, ভোগবাদী সমাজ, ভোগবাদী ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ এবং বিবেকহীন প্রযুক্তিবাদ, তাঁর সমন্বয়ের চেষ্টাকে সফল হতে দেয়নি। মানুষের ধর্ম কীভাবে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম হয়ে উঠেছে সেই সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধে। ভারতীয় দর্শনের সারাৎসারকে রবীন্দ্রদৃষ্টিতে ব্যক্ত করেছেন প্রাবন্ধিক। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের এক বিশেষ সখ্যতা ছিল।এই উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে এক আলাপচারিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতি যখন এক সুরে বাঁধা পড়ে তখনই আমরা অনন্তের মধ্যে সত্যকে খুঁজে পাই, সুন্দরকে অনুভব করি'। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও অধ্যাত্মচিন্তার মূল কথা যে মানবকেন্দ্রিক বিশ্বদর্শন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বস্তুতান্ত্রিক জগতের বর্ণনা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে ছাড়া সম্ভব নয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। *দেশ* পত্রিকায় এই নিয়ে আলোচনা করেছেন বিমলকৃষ্ণ মতিলাল তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও অধ্যাত্মচিন্তা' নামক প্রবন্ধে।

ভবতোষ দত্তের 'রবীন্দ্রচর্চার পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থটির সম্পর্কে আলোচনা করেছেন আনন্দগোপাল ঘোষ। রবীন্দ্রচর্চার ব্যাগ্রতা যে দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন লেখক। রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সাহিত্যালোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন, তাঁর ব্যাপ্তি যে সমাজচেতনায় মিশে গেছে তারই রূপরেখা দিয়েছেন লেখক। শুধু ভারতবর্ষের মধ্যে নয়, ভারতের বাইরেও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটু অন্যরকম ভাবার প্রবণতা বাংলাভাষা ছাড়াও অন্যান্য ভাষাতেও পরিলক্ষিত। ফলে রবীন্দ্রচর্চার একটি সুস্পষ্ট বাঁক এই সময়েই তৈরি হচ্ছে ধীরে ধীরে। তবে রবীন্দ্রজীবনের নবমূল্যায়নে যাঁর নাম সর্বাগ্রে লেখা থাকবে তিনি হলেন প্রশান্তকুমার পাল। রবীন্দ্রজীবনীকে এক অভিনব রূপদানে সক্ষম হয়েছেন তিনি। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, অধ্যাবসায়, অন্তর্দৃষ্টি নতুন রবীন্দ্রনাথকে পাঠকের দরবারে এনে হাজির করেছে। 'রবীন্দ্রজীবনী : নূতন ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রশান্তকুমার পাল নবমূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। প্রবন্ধকারের মতে পূর্বে রচিত রবীন্দ্রজীবনীগুলিতে

যে উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে তার বাইরে এখনও বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রবীন্দ্রপত্রাবলি, সাময়িকপত্র এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ, রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজনদের লেখা দিনলিপি, রবীন্দ্ররচনার পাণ্ডুলিপি ও পাঠান্তর, রবীন্দ্রনাথের ছবি ও ফটোগ্রাফ ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে রবীন্দ্রজীবনকে নতুন করে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। আবার একইসময়ে একটু অন্যভাবে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানভাবনাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 'কালের মন্দিরা : আধুনিক বিজ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। বিজ্ঞান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বেশ ভালোই খোঁজখবর রাখতেন। ইলিয়া প্রিগোঝিন-এর মতো রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করতেন, প্রাণ আর অপ্রাণের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে। অতিদীর্ঘ ও জটিল অভিব্যক্তির মধ্য দিয়েই অপ্রাণ থেকে ক্রমশ প্রাণের উদ্ভব। পদার্থবিদ হাইজেনবার্গ একটি সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে দারুণভাবে উপকৃত হয়েছিলেন তা স্বীকার করেছেন।

চিত্রশিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কতটা মৌলিক তার আলোচনাও উঠে এসেছে *দেশ* পত্রিকার পাতায় পরিতোষ সেন রচিত 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা' প্রবন্ধে। আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাণ্ডুলিপির পরিবর্তনের জন্য কাটাকুটি করতেন এবং এই কাটাকুটির দ্বারা তৈরি হত এক অপূর্ব চিত্র। বলা যায় এখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কনের সূচনা। বিচিত্র সব প্রাণী, পাখি, মানুষ, মিলে তৈরি করতেন অদ্ভুত এক প্রকৃতি জগৎ। এছাড়া লতাপাতা, পাহাড়, পর্বত, নদী, নালা ইত্যাদি পাণ্ডুলিপির পাতায় তাঁর মনের রাজ্য থেকে উঠে আসত। মানুষের ফিগার পোট্রেটগুলি যেন এক-একটি জীবন্ত চরিত্র। রঙের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি মৌলিক। অন্যদিকে পান্নালাল দাশগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের গ্রামীণ চিন্তা ও উন্নয়ন ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'রবীন্দ্রনাথের পল্লীচিন্তা' প্রবন্ধে। ইংরেজ শাসনের কুফল গ্রাম-সমাজকে এক ভয়ংকর পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ গ্রামের আত্মশক্তি জাগরণের উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সেইসব বিষয়ে আলোচিত হয়েছে উক্ত প্রবন্ধে। নিঃসন্দেহে প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের গ্রামভাবনার অনেক দিক উন্মোচিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, বাঙালিদের শোকে-দুঃখে, সুখে-আনন্দে, তাঁর গান না গেয়ে উপায় নেই। যুগে যুগে এ গান তাদের গাইতেই হবে। তাঁর মৃত্যুর ৫০ বছর পরও কথাগুলি কতখানি সত্যি এবং খাঁটি, সেই নিয়ে *দেশ* পত্রিকায় আলোচনা করেছেন শান্তিদেব ঘোষ 'বাঙালি জীবনে রবীন্দ্রসংগীত' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে হলে অনুবাদ ও ভাষান্তরের দায়িত্ব নিতে হবে প্রাচ্যকে, তবেই পশ্চিমে রবীন্দ্রনাথ আরও ছড়িয়ে পড়বেন। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছেন 'পূর্বমুখী ধারায় পশ্চিম প্রাণ' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের মননশীল প্রবন্ধগুলি আজকের দিনে কতটা প্রাসঙ্গিক এই নিয়ে লিখেছেন সত্যেন্দ্রনাথ রায় 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ : পঞ্চাশ বছরের দূরত্ব থেকে' প্রবন্ধে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র-উপন্যাসকে সমালোচকেরা দেখেছেন। সেগুলি নিয়ে মন্তব্য করেছেন সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ' রবীন্দ্রোপন্যাস : সময়ের চাকায়' প্রবন্ধে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের বারোটি উপন্যাস'[৪] শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের সবক'টি উপন্যাসকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র-কাব্য নিয়ে মতামত পোষণ করেছেন দীপ্তি ত্রিপাঠী 'রবীন্দ্রকাব্য-সমালোচকের দৃষ্টিতে' নামক লেখায়। রবীন্দ্রনাথ যে শুধুমাত্র রোমান্টিক কবি নন, তিনি একাধারে মিস্টিক, রিয়ালিস্ট, সিম্বলিস্ট, ফিউচারিস্ট, ফবিস্ট, সুররিয়ালিস্ট, কমিউনিস্ট এবং ন্যাশানালিস্ট তা দেখিয়েছেন রবীন্দ্ররচনার আলেখ্যে।

শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়; বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে আভিনন্দিত ও সম্মানিত হয়েছিলেন সেই সম্পর্কে লিখেছেন ভুঁইয়া ইকবাল 'বাংলাদেশে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা'[৫] প্রবন্ধে। ১৯১৯ সালে সিলেট এবং ১৯২৬ সালে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় কবিকে অভিনন্দিত করে প্রদত্ত কয়েকটি মানপত্রের উল্লেখ এবং অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রবন্ধটিতে সংকলিত হয়েছে। 'কবির চিঠি কবিকে' প্রবন্ধটি

সম্পাদনা করেছেন নরেশ গুহ, এই প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর ১০৮ টি পত্র এখানে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ভবতোষ দত্তের 'কপিরাইট ও বিশ্বভারতী' প্রবন্ধটিও একটু ভিন্ন স্বাদের, কারণ কপিরাইট উঠে যাবার পর বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রয়োজনীয় সব কাজ শেষ করতে পারবে কিনা এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা রয়েছে। বিশুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ, সুলভ রবীন্দ্রনাথ, সমগ্র রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ নেয় সেই চেষ্টা কতটা সফলকাম হবে সেই নিয়ে মতামত জানিয়েছেন লেখক। 'শান্তিনিকেতন মন্দির ও পৌষ উৎসবের শতবর্ষ' প্রবন্ধে পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন পৌষ উৎসবের সূচনা ও ইতিহাস। মহর্ষি প্রতিষ্ঠিত এই উপাসনা মন্দিরের বহু তথ্যের সমাহারে সাজানো এই লেখাটি।

১৯৯৯ সালে *পশ্চিমবঙ্গ* পত্রিকায় রবীন্দ্রসংখ্যায় আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত বিবিধ প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রচর্চা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে শুধুমাত্র বিশ্বকবি নন, একজন বড়ো মাপের মানুষ যাঁর প্রজ্ঞা অনন্ত, অসীম। শিল্পসাহিত্য--সংগীত ইত্যাদি দ্বারা তিনি সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব দর্শন, যার দ্বারা লালিত হয়েছে আমাদের নব্যবঙ্গসংস্কৃতি, সমগ্র দেশ ও জাতির পথপ্রদর্শক যিনি, সেই মানুষটি আমাদের কাছে ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছেন। রবীন্দ্রনাথের বাণী আমাদেরকে প্রতিনিয়ত উজ্জীবিত করে চলেছে, গণচৈতন্য জাগরনেও প্রভাবিত করেছে। একবিংশ শতকে বিজ্ঞান ও শিল্পপ্রযুক্তির চরম উন্নতির যুগে এসেও কুসংস্কার ও বিভেদের প্রাচীর ভাঙার জন্যই প্রয়োজন রবীন্দ্রনাথকে। শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জনের নিমিত্তে আমাদের রবীন্দ্রচর্চা নয়, দেশ ও সমাজকে সুরক্ষিত রাখার জন্যও অপরিহার্য রবীন্দ্রনাথ। আজ সুগভীর অন্ধকারে নিমজ্জমান গোটা বিশ্ব। বাতাসে বারুদের গন্ধ, মানুষ ও মানবিকতা বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে। এই সংকটকালে একমাত্র পরিত্রাতা হতে পারেন শুধু রবীন্দ্রনাথ। পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার এই সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রজীবনের নানা পর্বে সমসাময়িক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ও পারস্পরিক মূল্যায়ন। এছাড়া রবীন্দ্রসাহিত্যের কয়েকটি দিকও পর্যালোচিত হয়েছে। বিদগ্ধ প্রাবন্ধিকেরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ মতামতের মধ্যে দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন এই সংখ্যাটিকে।

বিংশ শতকের শেষ দশকটিতে আমরা বহু অজানা তথ্য জানতে পারলাম বেশ কয়েকটি প্রবন্ধের মাধ্যমে। রবীন্দ্রচর্চার গতিপ্রকৃতি কোনদিকে মোড় নিচ্ছে, কোন কোন দিকের উৎসমুখ খুলে দিচ্ছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল। আবার অনেককিছু বিষয় বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা গেল না স্থানাভাবের কারণে। তবে যে অমূল্য প্রবন্ধগুলি আমরা হাতের কাছে এই শতকে শেষ দশকে পেলাম তাতে করে 'অন্য রবীন্দ্রনাথ' বা 'অজানা রবীন্দ্রনাথ'-কে জানতে পারলাম বললে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষ করে ২০০০ সালের দেশ পত্রিকার 'বৈশাখের নমস্কার' সংখ্যাটি অনবদ্য। এই সংখ্যাটিতে আমরা পেলাম – ১) সংগ্রহ : সংরক্ষণ : গবেষণা – রবীন্দ্রচর্চার সম্ভাবনা। লিখেছেন স্বপন মজুমদার। (পৃঃ ৩৭-৪০) ২) রবীন্দ্রনাথের মানসসন্তান প্রশান্তচন্দ্র – লিখেছেন উমা দাশগুপ্ত (পৃঃ ৪১-৪৬) ৩) দশটা চারটের আন্দামান : স্কুল পলাতক রবীন্দ্রনাথ – লিখেছেন নিত্যপ্রিয় ঘোষ। (পৃঃ ৫১-৫৫) ৪) সম্মানিত রবীন্দ্রনাথ : আমেরিকা পর্ব – বারিদবরণ ঘোষ (পৃঃ ৫৬-৬৩)। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় কীভাবে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন বা আমেরিকাকে কবি কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন বা আমেরিকা কবিকে কীভাবে গ্রহণ করেছিল তার একটা রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বলা ভালো যে, ১৯১২ - ১৯৩০ সালের মধ্যে মোট পাঁচ বার আমেরিকা যান রবীন্দ্রনাথ। পাঁচটি পর্বে বিধৃত হয়েছে এই প্রবন্ধটি। অজানা তথ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ চিন্তাশীল এই প্রবন্ধ। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নাম অনেকসময় আমাদের চর্চার মধ্যে আসে না। কিন্তু এই মানুষটি রবীন্দ্রজীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা রবীন্দ্রনাথ নিজে বহু জায়গায় ব্যক্ত করেছেন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশও রবীন্দ্রধ্যানে সদাই মগ্ন থাকতেন। তারই পরিচয় দিয়েছেন প্রাবন্ধিক উমা দাশগুপ্ত ধারাবাহিক রচনায় 'রবীন্দ্রকল্পনায় বিশ্বমানব' শিরোনামে। সামাজিক দায়িত্বসচেতন মানুষ হিসাবে ৫৩ বছর বয়সে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ১৯৪৩ সালে একটি দিনলিপিতে সহজভাবে লিখে

গেছেন তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি – "...শুধু statistics এর research বা কাজ নিয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। মানবসভ্যতার বা বিশ্বমানবের যে আদর্শ রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের বাণীতে প্রকাশ পেয়েছে সে সম্বন্ধে আমার একটা দায়িত্ববোধ আছে। তাই ব্রাহ্মসমাজ বা বিশ্বভারতীর কাজে একদিন হাত দিয়েছিলুম। তারপর আমি statistics এর কাজে..."[৬] মানুষের সাথে, মানুষের কাছে সবসময় থাকার চেষ্টা করেছেন তিনি। এসব কথা আরও বিস্তারিত পাওয়া যাবে নির্মলকুমারী দেবীর স্মৃতিচারণে ও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সটিটিউটে সংরক্ষিত কাগজপত্রে।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য-তত্ত্ব ঐতিহাসিকভাবে থেমে গেছে। তারপর বিশ্বপটে ঘটে গেছে বহু পরিবর্তন যার ফলশ্রুতি ঘটেছে সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতিতে। প্রত্যেক কবি সাহিত্যিকই স্বীকার করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গৌরবকে। আধুনিক তরুণ প্রজন্মের মুখে মুখে ফেরে গঠনবাদ-উত্তর - গঠনবাদ উত্তর-উপনিবেশবাদ – বার্তে-ফুকো-দেরিদা; কিছু তত্ত্ব, কিছু নাম। কিন্তু এই দেশে যেখানে আধুনিকতাই পাশ্চাত্যের আনুরূপ্যে আসেনি সেখানে কি রবীন্দ্র সাহিত্য বা রবীন্দ্র ভাবনা হীরের ধারে উত্তরাধুনিকদের চাকচিক্যসর্বস্ব কাচের জানালা দু'টুকরো করে দিতে পারেনা? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে যাই জীবনানন্দ দাশের লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধ থেকে। জীবনানন্দের ভাষায় – "তাহলে একথা বাস্তবিকই বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সাহায্য ও ইঙ্গিত পেয়ে আজ যে-আধুনিক কাব্যের সূত্রপাত হয়েছে তার পরিণাম - বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি ভেঙে ফেলে কোন সম্পূর্ণ অভিনব জায়গায় গিয়ে দাঁড়াবে, সাহিত্যের ইতিহাস এরকম অজ্ঞাতকুলশীল জিনিস নয়। ইংরেজ কবিরা যেমন যুগে-যুগে ঘুরেফিরে শেক্সপীয়র –এর কেন্দ্রিকতার থেকে সঞ্চারিত হয়ে বৃত্ত রচনা করে পরিব্যাপ্ত হয়ে চলেছে, আমাদের কবিরাও রবীন্দ্রনাথকে পরিক্রমা করে তাই করবে - এই ধারণা প্রত্যেক যুগসন্ধির মুখে নিতান্তই বিচার সাপেক্ষ বলে বোধ হলেও অনেক কাল পর্যন্ত অমূলক অসঙ্গত বলে প্রমাণিত হবেনা –এই আমার মনে হয়।"[৭] অর্থাৎ রবীন্দ্র-উত্তর কবিরা শুধুমাত্র ব্যর্থ রবীন্দ্র অনুকারী হয়ে নয়, রবীন্দ্রনাথের অন্তঃস্থলের মানবিক গুণকে বা নন্দনভাবনাকে পাথেয় করে 'রবীন্দ্র-পরিক্রমা' সম্পন্ন করবেন। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক সকলেই রবীন্দ্রনাথের ঋণ স্বীকার করে নিয়েছেন। একমাত্র 'কল্লোল' যুগে রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাংলাদেশের একদল তরুণ কবিরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবকে অস্বীকার করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন। এই সময়টাকে বলা যেতে পারে আমাদের সাহিত্যের সংকট কাল। 'মহুয়া' কবিতা রচনাকালেই রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে (১৩৩৫ বঙ্গাব্দে) অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-কে লিখেছিলেন, 'সে প্রবৃত্তি (মিথুন প্রবৃত্তি) মানুষের নেই, বা তা প্রবল নয় এমন কথা কেউ বলে না। কিন্তু সকল বিষয়েই যেমন সংযম আবশ্যক এক্ষেত্রেও।... এরকম বিকারের বর্ণনার স্থান সাহিত্যে নয়, এটা ডাক্তারি শাস্ত্রে শোভা পায়।' রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে সাহিত্যকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে 'রস' শব্দটি এসেছে বারবার এবং কল্লোলীয়দের সঙ্গে বিতর্কেও 'রস' শব্দটিকেই রক্ষাকবচ হিসাবে তিনি ব্যবহার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নান্দনিকতা বোধ করে উঠেছিল গড়ে উঠেছিল উপলব্ধি ও অর্জনের ভিতর দিয়ে। নিজস্বতা ও পরিগ্রহণের মধ্য দিয়ে তিনি সৃষ্টিরূপ দিয়েছিলেন। স্ব-মতপ্রকাশে তিনি ছিলেন অনড় ও দৃঢ়। তাঁর সমকালে অনেক আন্দোলন তাঁকে আঘাত করলেও তিনি কখনই বিচলিত হয়ে যাননি। তিনি চিরকাল সত্যের অনুভূতিকেই প্রকাশ করে গেছেন। মানবিক কল্যাণের দিকেই সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। তিনি কোনো গোষ্ঠী-নির্ভর প্রতিষ্ঠানের সদস্য কোনোকালেই ছিলেন না। কোন সাহিত্যিক আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন না। যাঁরা রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন তাদের যে পা পিছলে যাওয়ার ভয় নেই সে কথা প্রমাণিত।

সুবিনয় রায় 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর-সংরক্ষণ'[৮] প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গানের সুর সংরক্ষণ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত দিয়েছেন। ২০০১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথেই কপিরাইট উঠে যাবার পর রবীন্দ্রগানের গতিপ্রকৃতি স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে কিনা এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন প্রাবন্ধিক, এবং তা যদি হয় তাহলে এই বিষয়ে কী কী সর্তকতা অবলম্বন প্রয়োজন তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাবন্ধিক মনে করেন রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর সংরক্ষণ আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। ৬২ টি খন্ডে প্রকাশিত গ্রন্থমালা রবীন্দ্রসংগীতের সুরের ধারক ও বাহক। তবে এই স্বরলিপি নিয়ে মতভেদও রয়েছে, আবার স্বরলিপি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতাও সুস্পষ্ট। কিন্তু যা আছে তার যথাযথ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন যথাযথ শিক্ষাগুরু। অনভিজ্ঞ বা স্বল্প অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে স্বরববিতানের স্বরলিপির কলাকৌশল ধরা দেবে না। প্রাবন্ধিক মনে করেছেন বর্তমান স্বরলিপি পদ্ধতির উন্নয়ন সম্ভব। তবে গায়কিই পারে একমাত্র এই সমস্যার সমাধান করতে। এই কারণেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে গায়কির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুর সংরক্ষণের পাশাপাশি গায়কিরও সংরক্ষন ও প্রচার আবশ্যিক। আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে রেকর্ড করা টেপ-এর দ্বারা গায়কির সংরক্ষণ কিছুটা করা যেতে পারে। বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজ কিছুটা হলেও করতে পেরেছে। এছাড়া গীতবিতান, দক্ষিণী, সুরঙ্গমা, রবিতীর্থ, ইন্দিরা, গান্ধর্বী প্রভৃতি সংগীতশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি প্রচেষ্টা সাধুবাদযোগ্য। শুধু গায়কি সংরক্ষণ এবং প্রচারই নয়, শ্রোতাদেরও প্রামাণ্য গায়কির গান ক্রমাগত প্রচারের মাধ্যমে শুনিয়ে যেতে পারলে, তাদের উপলব্ধি ও রসবোধকে আরো উন্নত করতে পারলে রুচিশীল শ্রোতা তৈরি হবে যার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীত, গায়কি সংরক্ষন চেষ্টা সফল হবে। রবীন্দ্রসংগীত প্রসারে ও প্রচারে যিনি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি হলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০১-১৯৭৪)। তাঁর এই অবদানের কথা পর্যালোচনা করেছেন বিশিষ্ট গবেষক ও অধ্যাপক অরুণকুমার বসু 'রবীন্দ্রসঙ্গীত-বন্দরের এক আলোকস্তম্ভ'[৯] শীর্ষক প্রবন্ধে। রবীন্দ্রসংগীতকে কবির কণ্ঠ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠে ছড়িয়ে দেবার সংকল্পে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রসংগীতের সংরক্ষণ, শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়াসে এই মানুষটি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী। তার কার্যকলাপকে প্রাবন্ধিক খুব সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন আলোচ্য প্রবন্ধে।

গুণমান ও গ্রহণযোগ্যতার বিচারে *বিশ্বভারতী* পত্রিকা রবীন্দ্রচর্চায় বিশেষ স্থান দখল করে আছে। শ্রাবণ ১৪১০ অর্থাৎ ২০০৩ সালে সুজিতকুমার বসু 'রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল কতখানি ছিল সেই বিষয়কে সামনে রেখেই আলোচনা করেছেন এই প্রবন্ধে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা রেখেই তাঁর কবিসত্তা লালিত হয়েছিল। বিজ্ঞানের প্রতি কবির ঝোঁক ছিল ছোটবেলা থেকেই। তিনি 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন – "এই সময়ে বিজ্ঞান পড়িবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছিল। তখন হক্‌স্‌লির রচনা হইতে জীবতত্ত্ব ও লক্‌ ইয়ার, নিউকোম্ব প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতাম।"[১০] পিতা দেবেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ কম ছিল না। তিনি কনিষ্ঠ পুত্রকে হিমালয় ভ্রমণের সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানে উৎসাহী করে তুলেছিলেন। 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর বিজ্ঞান চেতনার স্বরূপ তুলে ধরেছিলেন। বালক রবির বিজ্ঞানের প্রতি কৌতূহল পরবর্তী জীবনে জিজ্ঞাসায় পরিণত হয়। এইজন্য কবিকে যথেষ্ট পড়াশোনাও করতে হয়েছিল। সাধারণ মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ যখন পরিচিত হয়ে উঠেছেন তার আগে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব আবিষ্কার হয়ে গেছে। যেমন - আলোকের বিদ্যুৎ-চুম্বক-তরঙ্গ (Electro magnetic wave)। এই তত্ত্ব প্রমাণ করেছে শক্তির রূপ পরিবর্তিত হয় কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। বর্ণালী-বিশ্লেষণ (Spectral analysis), পদার্থের পরমাণুর স্বরূপও তখন জানা গিয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানচেতনাকে কবি স্বীকার করে নিয়েই তিনি কাব্যরচনা করেছেন। তাঁর অনেক কবিতায় জড় ও চেতনার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় প্রকাশিত 'জড় কি সজীব?' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ পাঠ করে

জগদীশচন্দ্র বসু অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। সহজ করে বৈজ্ঞানিক সত্যকে পরিস্ফুট করেছিলেন তিনি এই প্রবন্ধে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকারের বিষয়টিও সকলেই জানেন। কবি ও বিজ্ঞানীর কথোপকথনের দ্বারা জানা যায় কবির বক্তব্য ছিল, বিজ্ঞান হল মানুষের সেই সুদীর্ঘ সাধনা যা ভুলভ্রান্তির ভিতর দিয়ে, অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে, জাগ্রত চৈতন্যের ভিতর দিয়ে ক্রমাগত প্রকৃতিকে জানতে চেষ্টা করে আসছে। 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থটি কবি লিখেছেন ছিয়াত্তর বছর বয়সে। সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব মিলন একমাত্র এই রচনায় পাওয়া যায়। 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের বিষয় 'নক্ষত্রলোক' 'পরমাণুলোক' লিখতে গিয়ে কবিকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়েছিল। আপেক্ষিকতাবাদ, পরামাণু কেন্দ্রের তত্ত্ববিষয়ক অনেক বই তিনি পড়েছিলেন। প্রায় চার বছর ধরে এই বই তিনি লিখেছিলেন। বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে লিখেছেন - "শিক্ষা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেবার কাজে সাহিত্যের সহায়তা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই।"[১১] 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থটিতে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। সেগুলি হল 'পরমাণুলোক', 'নক্ষত্রলোক', 'সৌরজগত', 'ভূলোক' এবং 'উপসংহার'। সহজভাবে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই কবি এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিজ্ঞান হল মানুষের এমন একটি সংস্কৃতি যা অন্যান্য প্রাণীদের থেকে তাকে পৃথক করেছে। তাঁর কথায় - "মানুষ সহজ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা। প্রকাশলোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশলোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ করে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলই অবারিত করেছে।"[১২] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গত অভিজ্ঞতার (Sense impression) মধ্যে দিয়েই মানুষ এই প্রকাশলোককে জানতে পারবে। প্রাবন্ধিক সুজিতকুমার বসুর রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের স্বরূপ খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন।

বিভিন্ন রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ, রবীন্দ্রানুরাগী, পাঠকদের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে রবীন্দ্রচর্চার ধারাবাহিকতা ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের বাইরেও বহমান। এইসব আলোচনা-সমালোচনাকে কেন্দ্র করে উঠে আসা বিভিন্ন প্রশ্ন যেমন সহৃদয় পাঠকের মানসমুকুরে উদিত হয়েছে, তেমনি তার সন্তোষজনক উত্তরও পেয়েছেন। তবু রবীন্দ্রনাথ আজও আমাদের কাছে অনেকটাই অজানা। আসলে রবীন্দ্রনাথ এমনই একজন মানুষ যাঁর সম্পর্কে আলোচনার বহু দিক রয়েছে। কোনও একটি দিক নিয়ে ব্যাখ্যা করলে সম্পূর্ণভাবে তাঁকে ধরা যায় না। বহু দিকের আলোচনা তো দূর অস্ত। তবুও আমাদের রবীন্দ্রচর্চার মাধ্যমে পরশপাথর খুঁজে চলার চেষ্টা চিরন্তন। এই নিরন্তর চেষ্টায় যতটুকু তথ্য আমরা পেয়েছি তাই দিয়েই রবীন্দ্রচর্চায় মনোনিবেশ করতে পারি। একবিংশ শতকের প্রথম দশকের গোড়ায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চিন্তাভাবনার সমূহ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। তাঁকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দিক উন্মোচনের প্রয়াস দেখা দিল। মানুষ রবীন্দ্রনাথের আলোচনা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেল বলা যায়। মানবিকতা, বিশ্বমানবিকতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভাবনা ইত্যাদি বহুল পরিমাণে চর্চিত হতে লাগল। রবীন্দ্রচর্চার উজ্জ্বল উপস্থিতি ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিদগ্ধ মানুষদের বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে অনেক অজানা তথ্য উদ্‌ভাসিত হতে লাগল। স্থানাভাবের কারণে অনেক আলোচনা বাকী থেকে গেল। তবু বলা যায়, বিগত দুই দশকে রবীন্দ্রচর্চায় শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতির প্রসঙ্গ যেমন এসেছে তেমনই মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বা সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও এসেছে তবে তা পাঠকের কাছে আধুনিক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা রূপে ধরা দিয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শিল্পসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রে রবীন্দ্রানুরাগীরা আজও রবীন্দ্র-ভাবধারাকে বহন ও বাহন করে নিয়ে চলেছে। এখানেই রবীন্দ্রচর্চার সার্থকতা।

পাদটীকা :

১. দেশ, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৯১
২. তদেব, বর্ষ ৫৯, সংখ্যা ৪৬, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯২
৩. তদেব, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৯২
৪. তদেব, সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৯১
৫. তদেব।
৬. প্রশান্তচন্দ্রের দিনলিপি, ১৯৪৩
৭. 'কবিতার কথা', ১৩৬২
৮. পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ৩৪, সংখ্যা ৪৩-৪৪, ৪ ও ১১ মে, ২০০১
৯. তদেব।
১০. জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৯, পৃ. ১২৭, পাণ্ডুলিপি।
১১. বিশ্বপরিচয়, ভূমিকা অংশ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, ১৯৩৮।
১২. বিশ্বপরিচয়, উৎসর্গ পত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ, ১৯৩৮।

গ্রন্থপঞ্জি :

আকর গ্রন্থ

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'ছেলেবেলা'। রবীন্দ্ররচনাবলী। ত্রয়োদশ খণ্ড। বিশ্বভারতী, ১৯১৩।
২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'গীতবিতান'। অখণ্ড। কলকাতা, বিশ্বভারতী, সংস্করণ ১৩৩২, পুনমুদ্রণ ভাদ্র ১৪০৮।
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্ররচনাবলী। অচলিত সংগ্রহ খণ্ড ১। কলকাতা, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৪৭।
৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্ররচনাবলী। খণ্ড ৮। কলকাতা, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনমুদ্রণ ১৪১৭।
৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্ররচনাবলী। খণ্ড ১৬। কলকাতা, প.ব.স, মে ২০০১।

সহায়ক গ্রন্থ

১. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - সাহিত্য জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথ, করুণা প্রকাশনী, মার্চ ২০০২, কল ৯।
২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য - রবি ঠাকুরের কুঠার, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪।
৩. অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় - রবীন্দ্র-সমীক্ষা, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৪।
৪. অলোক রায় - উনিশ শতক, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫।
৫. উমা দাশগুপ্ত - 'রবীন্দ্রনাথ', প্রথম আনন্দ সংস্করন ২০০৮।
৬. জ্যোতির্ময় ঘোষ - রবীন্দ্রমনন ও সৃষ্টিলোক, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৮, কল ৭৩।
৭. শঙ্খ ঘোষ - কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক, দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ ২০০৯, কল ৭৩।
৮. শঙ্খ ঘোষ - ভিন্ন রুচির অধিকার, তালপাতা, ২০০৯, কলকাতা।
৯. শান্তিদেব ঘোষ - জীবনের ধ্রুবতারা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২২ শ্রাবণ ১৪০৩, কল ৯।
১০. শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় - দেশ পত্রিকায় রবীন্দ্রচর্চা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৫, কল ৯।
১১. কেতকী কুশারী ডাইসন ও সুশোভন অধিকারী - রঙের রবীন্দ্রনাথ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭।
১২. প্রণবকান্তি মুখোপাধ্যায় - রবি ঠাকুরের মা, নাথ পাবলিশিং, ২০১০।
১৩. বারিদবরণ ঘোষ - রবীন্দ্র সংবর্ধনার ইতিবৃত্ত দেশে ও বিদেশে (প্রথম খণ্ড), দীপ প্রকাশন, ২০০৭, কল ০৬।

ইংরেজি গ্রন্থ :

1. Dutta, Krishna, Andrew Robinson (eds.), *Selected Letters of Rabindranath Tagore*, New Delhi: Cambridge University Press, 2005.
2. Lago, Mary M., *"India's Prisoner": A Biography of Edward John Thompson 1886-1946*, Missouri, 2001.
3. Thompson, E. P., *Alien Homage : Edward Thompson and Rabindranath Tagore*, Delhi : Oxford University Press, 1993.
4. *Tagore by Fireside*; Maitraye Devi,Translated and adapted by the author from her Bangla work *Mungpu-te Rabindranath* ; Rupa & Co.; New Delhi; 2002.
5. *Qanungo, Narendranath; The Renascent Bengal at the Cross - Roads; C.M. Bajaj; 2001*.

সহায়ক পত্রপত্রিকা

১. দেশ; শারদীয় ১৩৯৮।
২. পশ্চিমবঙ্গ; সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৬।
৩. বিশ্বভারতী পত্রিকা; শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪১২।
৪. পশ্চিমবঙ্গ; মে ২০০৪।
৫. দেশ; ২৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭, ৬৫ বর্ষ ৬০ সংখ্যা।
৬. দেশ; ২ মে ১৯৯৮, ৬৫ বর্ষ ১৪ সংখ্যা।
৭. দেশ; ৪ মে ২০০৩, ৭০ বর্ষ ১৩ সংখ্যা।
৮. সাহিত্য-সংস্কৃতি। কার্তিক-পৌষ ও মাঘ-চৈত্র ১৪১২।
৯. দেশ; ১৮ ডিসেম্বর ২০০১।
১০. দেশ; ২ ফেব্রুয়ারি ২০১০।
১১. দেশ; ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১০।
১২. রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা; ১৪০২।
১৩. রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা; ১৪০৩।
১৪. আনন্দবাজার পত্রিকা; শারদীয় ১৪০৮।
১৫. আজকাল; শারদসঙ্কলন ১৪১৭।